প্রাণের উৎপত্তির ধাপগুলো

(প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে -৫)

অভিজিৎ রায়

পূর্ববর্তী পর্বের পর...

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলো-এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;

--জীবনানন্দ দাশ

বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে ল্যাবরেটেরীতে কি কখনও প্রাণ তৈরি করতে পারবে? এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া আজকের দিনের বিজ্ঞানীদের জন্য একটি মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতেই ওপারিন ও হালডেন প্রস্তাবিত জীবনের রাসায়নিক বিবর্তনের অনুকল্পটির সত্যতা যাচাই করা বেশ জরুরী একটি ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল একটা সময়। ইউরে-মিলারের ঐতিহাসিক পরীক্ষাটি নিঃসন্দেহে জীবনকে বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝবার ক্ষেত্রে একটি বড় অর্জন। এই পরীক্ষার ফলাফল থেকেই আমরা জেনেছি কৃত্রিমভাবে কোন জীবন বা জীবকোষ তৈরী করা এখনও সম্ভব না হলেও অনেক সরল অজৈব অণু (H_2, NH_3, CH_4, H_20, HCN প্রভৃতি) থেকে কোষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক উপাদানসমূহ তৈরী করা সম্ভব হয়েছে, ল্যাবরেটরীতেই। পাঠকদের মনে থাকবার কথা যে, মিলারের পরীক্ষায় বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য সরবরাহ করা হয়েছিল বিদ্যুৎ প্রবাহ, অতিবেগুনী আলো, উচ্চ শক্তির বিকিরণ আর তাপ (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এগুলো সবই কিন্তু আদিম পৃথিবীতে ছিল। কাজেই আদিম বিজারকীয় পরিবেশে অজৈব পদার্থ থেকেই জৈবপদার্থ উন্মেষের ধারণাটিকেই প্রাণ সৃষ্টির প্রাথমিক ধাপের ক্ষেত্রে সবচাইতে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হিসেবে বিজ্ঞানীরা গ্রহন করে নিয়েছেন, যদিও মহাকাশ থেকে অন্য কোন উপায়ে পৃথিবীতে প্রাণের আগমন ঘটার সম্ভাবনাকে (যেটিকে প্যানস্পারমিয়া নামে অভিহিত করা হয়) তারা বাতিল করে দেন নি[*]। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী মিলারের ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসের একটি সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ পাঠকদের জন্য তুলে ধরা মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাক্ষাৎকারে ডঃ মিলার বলছেন (Henahan, 1996) :

> 'আমরা সত্যই জানিনা আমাদের পৃথিবী তিনশ বা চারশ কোটি বছর আগে ঠিক কেমন ছিল। কাজেই সেখানে নানা ধরনের অনুমান আর কল্পনার অবকাশ থাকতে পারে। বড়

[*] সম্প্রতি জীববিজ্ঞানীরা সন্দেহ পোষণ করছেন যে আদিম পৃথিবীর পরিবেশ মিলার-ইউরে যেমনি ভেবেছিলেন ঠিক তেমন বিজারকীয় বোধ হয় ছিল না (Kerr, 1980)। আদিম পরিবেশ ছিল সম্ভবতঃ নিরপেক্ষ - এটি না বিজারকীয়, না জারীয়। ফলে প্যানস্পারমিয়া (Panspermia) তত্ত্বটি ইদানিং কালে বিজ্ঞানীদের কোন কোন মহলে নতুন করে জনপ্রিয় হয়েছে (Paul Davis, 2003)। আমরা প্যানস্পারমিয়া নিয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

> অনিশ্চয়তা হচ্ছে সে সময়কার পৃথিবীর পরিবেশ নিয়ে। মূল বিবাদটা এখানেই। পঞ্চাশ দশকের প্রথমার্ধে হ্যারল্ড ইউরে অভিমত দিলেন যে, আদি পৃথিবীর পরিবেশ সম্ভবত বিজারকীয় ছিল। কারণ, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুনসহ সৌরজগতের অন্যান্য সকল গ্রহের পরিবেশই এরকম। যদিও ওই আদি পরিবেশের গাঠনিক উপাদান নিয়ে বিতর্ক আছে, কিন্তু আমরা দেখিয়েছি যে হয় আপনাদের হাতে আদিতে বিজারকীয় পরিবেশ থাকতে হবে, নতুবা আপনি জীবন গঠনের জন্য কোন জৈব যৌগ পাবেন না। যদি আপনি ওগুলো পৃথিবীতে তৈরী না করেন, আপনাকে তাহলে ধুমকেতু, উল্কা কিংবা ধূলিকণার উপর নির্ভর করতে হবে। কিছু পদার্থ যে ওগুলোর মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছিল তা সত্যি। কিন্তু আমার মতে এ ধরনের উৎস হতে পাওয়া পরিমাণ এতোই কম যে তা জীবনের উৎপত্তি ঘটানোর জন্য যথেষ্ট নয়।'

ইউরে-মিলারের পরীক্ষাটি নিঃসন্দেহে একটি বড় মাইল ফলক, জীবনকে বুঝবার জন্য, জীবনের বস্তুবাদী ধারণাটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। কিন্তু এ পরীক্ষার ফলাফলই শেষ কথা নয়। কারণ, জৈব অণুগুলো জীবন গঠনের প্রথমিক উপাদান হতে পারে, কিন্তু কোন ভাবেই 'জীবন' নয়। জীবনকে বুঝবার জন্য, মানে জীবনের প্রক্রিয়াটিকে উপলব্ধি করবার জন্য বিজ্ঞানীরা তাই ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, যেগুলোকে ইংরেজীতে বলে 'সিমুলেশন এক্সপেরিমেন্ট'। এই সিমুলেশন এক্সপেরিমেন্টগুলো আমাদের সামনে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষনীয় সম্ভাবনার বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে; যেমন, জাগিয়ে তুলেছে নিউক্লিয় এসিডের উপাদান কিংবা এডেনোসাইন ট্রাইফসফেট (এটিপি) তৈরি হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাকে - যেগুলো আসলে কাজ করে জীবজগতে শক্তির আধার হিসেবে। অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, জীবন বা জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর আসলে প্রকৃতির বিভিন্ন ধরনের সিমুলেটেড পরীক্ষারই ফলাফল। তারা মনে করেন, যে বিক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে অজৈব পদার্থ থেকে জীবনের সরল অণু গঠিত হয়েছিল, সেগুলো সম্পন্ন হয়েছিল আসলে সমুদ্রের গভীর তলদেশে, বিজ্ঞানী হালডেন যাকে বলেন, 'উত্তপ্ত লঘু স্যুপ' (Hot dilute soup)। তবে বর্তমানে বিজ্ঞানীরা আরেকটি সম্ভাবনার কথাও বেশ জোরেসোরে বলছেন। সেটি হল, জৈব অণুগুলো সমুদ্রের স্যুপে গঠিত হয়নি, বরং তৈরী হয়েছিল পানিতে ডুবে থাকা এক ধরনের পাথুরে খনিজে; আর নয়ত জটিল, আধান যুক্ত কাদামাটির পিঠে। কাদা মাটির কথা বলা হল বটে, তবে এটি মনে রাখতে হবে, আজকের দিনে মাটি বলতে আমরা যা বুঝি, সেসময়কার মাটি ছিল এ থেকে ভিন্ন। জৈব ধবংসাবশেষ মিশ্রত জটিল সিলিকেট, যা এখনকার মাটির উপাদান, তা তখনও বিকশিত হয়ে ওঠেনি। আসলে চুর্ণ সিলিকেট, কোয়ার্জ, বা অন্যান্য আকরিকের ভগ্নস্তুপের জলীয় আবরণে আদি বিক্রিয়াগুলো সম্পন্ন হয়েছিল বলে মনে করা হয়। অনুমান করা হয়, শুধু অ্যামাইনো এসিড তৈরীতেই নয়, অ্যামাইনো এসিডগুলো পরস্পর বিক্রিয়া করে (ডিহাইড্রেশন) যে পলিপেপটাইড বা প্রোটো-প্রোটিন গড়েছিল, তার পেছনে প্রাচীন কাদা-মাটি আর খনিজ পদার্থগুলো একটা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল। অন্যান্য বৃহৎ বায়োপলিমারগুলোও

প্রায় একইরকম অনুঘটক দিয়ে প্রভাবিত হয়ে উৎপন্ন হয়েছিল। ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আজকের দিনেও আমরা দেখি রাসায়নিক শিল্পকারখানাগুলোতে জৈব পদার্থ তৈরীর জন্য অহরহই নানা ধরনের খনিজ ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইউরে-মিলারের পরীক্ষায় বিজারকীয় পরিবেশে অজৈব পদার্থ থেকে জৈব অণু সফলভাবে উৎপন্ন করার পর বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা শুরু হয় জীবনের পরবর্তী ধারাবাহিকতাগুলো জানবার, বুঝবার। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার মায়ামি ইউনিভার্সিটির সিডনি ফক্সের গবেষণার কথা একটু পাঠকদের বলা যাক, কারণ তার গবেষণা থেকেই আদি জীবকোষ তৈরীর একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। মিলারের পরীক্ষায় পাওয়া অ্যামাইনো এসিড, অ্যাসপারটিক আর গ্লুটামিক এসিডগুলোকে নিয়ে অধ্যাপক ফক্স উত্তপ্ত করলেন - ১৩০ থেকে ১৫০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায়; ফলে প্রোটিনের মত একটি দ্রব্য উৎপন্ন হল। এর নাম দেওয়া হল *তাপীয় প্রোটিনয়েড*। এটি অনেক দিক দিয়েই প্রকৃতিতে পাওয়া প্রোটিনের মত। অধ্যাপক ফক্স, এই সব প্রোটিনয়েডকে পানিতে সিদ্ধ করে ঠান্ডা করে পেলেন অনেকটা আদি কোষের মত দেখতে ঝিল্লিবদ্ধ *প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ার*। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে এগুলোকে একেবারে আদি কোষের মত দেখায়; শুধু তাই নয় - ল্যাবরেটরীতে উৎপন্ন এই মাইক্রোস্ফিয়ার গুলোকে কৃত্রিম ভাবে জীবাশ্মে পরিণত করেও দেখা গেছে প্রায় তিনশ কোটি বছর আগেকার প্রাথমিক জীবাশ্ম গুলোর সাথে এর অবিকল মিল!

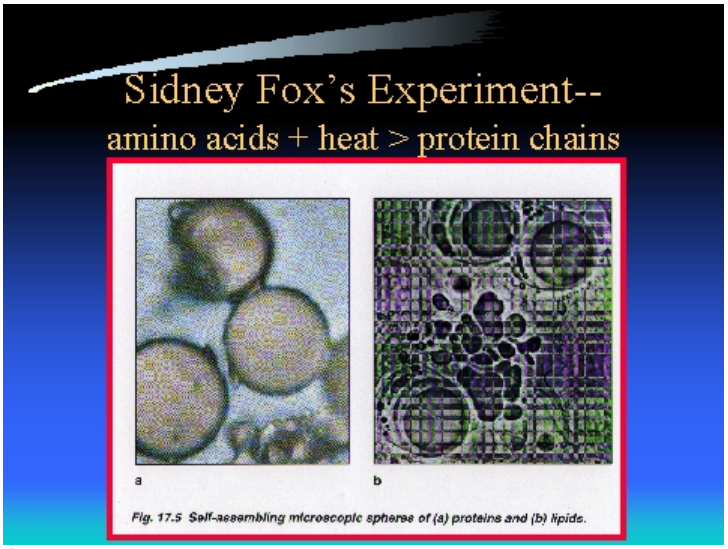

চিত্র ৫.১ : সিডনী ফক্সের পরীক্ষণ থেকে পাওয়া প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ার

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই মাইক্রোস্ফিয়ারগুলো কি জীবিত? মানে এদের কি সত্যই কোন প্রাণ আছে? প্রশ্নটি অধ্যাপক ফক্সকে করেছিলেন টিম বেরা (Berra, 1990)। এমনতর বেয়ারা প্রশ্ন

করবার কারণও আছে। এই প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ারগুলো প্রোটিনের দুটি স্তরে বিন্যস্ত, এরা বৈদ্যুতিকভাবে সক্রিয়, এর বহির্ভাগটি দেখতে অনেকটা কোষের ঝিল্লির মতই। এদেরকে যদি দ্রবণের মধ্যে বাধাহীন ভাবে বিচরণের সুযোগ দেওয়া হয়, এরা একই রকমের প্রোটিনয়েড শোষণ করে 'বৃদ্ধি প্রাপ্ত' হয়। এরা ঈষ্ট বা ব্যাকটেরিয়ার মতই নড়াচড়া করে, অঙ্কুরিত হয়। কোষ বিভাজনের মত একধরণের বিভাজনও ঘটে এদের। এটিপি সরবরাহ করা হলে এদের বিচলন ক্ষমতাও বেড়ে যায়। মাইক্রোস্ফিয়ারগুলো আস্রবণীয় (Osmotic) আর নির্বাচিত বিশোষণমূলক (selective difussion) ধর্ম প্রদর্শন করে, যা কিনা জীবিত কোষের মধ্যেই কেবল দেখা যায়। তার পরেও এই মাইক্রোস্ফিয়ার গুলো জীবিত কিনা, টিম বেরার এই প্রশ্নের উত্তরে ফক্স বলেছিলেন, এগুলো 'প্রোটো-এলিভ'; মানে, 'জীবন সদৃশ'।

অধ্যাপক ফক্স কিন্তু চাতুরী করে বেরার প্রশ্ন এড়িয়ে যান নি; তিনি এমনতর উত্তর দিয়েছিলেন, কারণ বিজ্ঞানের চোখে প্রাণ আর অ-প্রাণের সীমারেখাটা খুব স্পষ্ট আর পরিস্কার নয়। যেহেতু অজৈব জড় পদার্থ থেকেই প্রাণ বা জীবনের বিকাশ ঘটেছে, সুতরাং জড় জগৎ আর জীব জগতের মাঝামাঝি জায়গায় আমরা সাদামাঠাভাবে একটা সীমারেখা সবসময়ই আঁকতে পারি যেটা অতিক্রম করলে সমস্ত কিছুই জীবিত, আর ওই সীমা না পেরুলে সমস্ত কিছুই প্রাণহীন। আমরা সিরিজের দ্বিতীয় পর্বে ভাইরাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, ভাইরাস এমনিতে 'মৃতবৎ', তবে তারা 'বেঁচে' ওঠে অন্য জীবিত পোষকদেহ না জীবিত কোষকে আশ্রয় করে। কাজেই ভাইরাস বাস করে ওই প্রাণ অ-প্রাণের সীমারেখা বা বর্ডার লাইনের ঠিক মাঝখানে। তবে ভাইরাসই যে প্রাণের সবচেয়ে সরলীকৃত রূপ, তা কিন্তু নয়। ভাইরাসের চেয়েও সরল প্রাণের সন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন *ভিরইডস* (Viroids) এর মধ্যে। এগুলো মূলতঃ পেঁচানো সরল জেনেটিক পদার্থ দিয়ে তৈরী, যেগুলোকে টেনে লম্বা করলে বেড়ে ৩ ফুটের মত দাঁড়ায়। এই ভিরইডস জীবাণুর কারণে গাছপালায় 'avocado sun blotch', 'coconut cadang cadang' কিংবা 'tomato bunchy top' জাতীয় বিদ্ঘুটে নামের নানা ধরণের রোগের সৃষ্টি হয়। ভাইরাসের মত ভিরইডসদেরও জীবিত হওয়ার জন্য 'পোষক দেহ' দরকার হয়, নইলে এরাও জড় পদার্থের মতই আচরণ করে। ভিরইডসই শেষ নয়, এর চেয়েও ক্ষুদ্র পরিসরে বিজ্ঞানীরা জীবনের সন্ধান পেয়েছেন। যেমন ওই *প্রিয়নের* (prions) কথাই ধরা যাক। এগুলোর আকার এখন পর্যন্ত পাওয়া সবচাইতে ছোট ভাইরাসের একশ ভাগের এক ভাগ থেকে শুরু করে এক হাজার ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত। আর এগুলো এতই সরল যে এর মধ্যে জেনেটিক উপাদানও নাই, এগুলো স্রেফ প্রোটিন দিয়ে তৈরী। ভাইরাস আর ভিরইডসের মত এরাও জীবকোষে ঢুকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দখল নিয়ে নেয়। গবাদি পশু বিশেষত ভেরার মধ্যে *স্ক্রাপি* (scrapie) নামে একধরনের রোগের জন্য এই প্রিয়নগুলোকে দায়ী করা হয়। এই যে কিছুদিন আগে *ম্যাড কাউ* রোগ নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে এত তোলপার হল, এর পেছনেও কিন্তু দায়ী ওই প্রিয়নেরা। শুধু পশু পাখি নয়, মানবদেহে 'multiple sclerosis', 'Creutzfeld-Jacob',

'Gerstmann-Straussler-Scheinker syndrome', আর 'Lou Gehrig's' রোগের জন্যও এই প্রিয়নেরাই সম্ভবত দায়ী। প্রিয়নেরা বিজ্ঞানীদের জন্য সবসময়ই একটি বিস্ময়। কারণ, জেনেটিক পদার্থ (জিনোম আর নিউক্লিয়িক এসিড) বিহীন এই অদ্ভুতুরে হতচ্ছারা জিনিসটা শুধু প্রোটিন দিয়ে তৈরী হওয়া সত্ত্বেও কোষের অভ্যন্তরে উপযুক্ত পরিবেশে প্রাণের অভিব্যক্তি ঘটাতে পারে, রোগ ছড়াতে পারে। প্রিয়নের অস্তিত্ব জীববিজ্ঞানের এতদিনকার গড়ে ওঠা 'বিশ্বাসে' আঘাত করেছে - যেটি বলত, প্রতিটি জীবন্ত অবয়বের অনুলিপির জন্য নিউক্লিয়িক এসিড অত্যাবশ্যক। এখন জীব-জড়ের পার্থক্যসূচক বর্ডার লাইটি টনতে গিয়ে কিন্তু বিপদেই পড়ব আমরা। এটা কি ভাইরাসের উপর দিয়ে টানা হবে, নাকি প্রিয়নের উপর দিয়ে টানা হবে - এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। আবার, প্রিয়ন, ভিরইডস আর ভাইরাসকে 'প্রাণ' হিসেবে, কিংবা প্রাণের সরলতম প্রকাশ হিসেবে আভিহিত করতে অনেকেই আপত্তি তুলবেন। কারণ, এটা তো সত্যই যে, এদের প্রাণের নান্দনিক বিকাশ ঘটে তখনই যখন তারা উপযুক্ত জীবদেহ খুঁজে পায়। সে হিসেবে কিন্তু মাইক্রোস্ফিয়ার, যেগুলোর কথা আমরা একটু আগেই আলোচনা করেছি সেগুলোই হয়ত প্রথম জীবন বা জীবের পূর্বসুরী ছিল- একথা স্বীকার করে নিতেই হবে। কারণ মাইক্রোস্ফিয়ারের সাথে প্রোটোসেল বা আদিকোষের মিল অনেক। অধ্যাপক ফক্স যে ল্যাবরেটরীতে মাইক্রোস্ফিয়ারের সন্ধান পেয়েছিলেন, সেই *প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ার* গুলোই আসলে আদি কোষের উৎপত্তিতে অন্তরবর্তী ধাপ ছিল। এ প্রসঙ্গে সিডনী ফক্স বলেন (Fox, 1988) :

> 'প্রোটিনয়েড হচ্ছে জটিল প্রোটিন সদৃশ পদার্থ, এবং মাইক্রোস্ফিয়ার অনেকটা কোষ সদৃশ একক, যা তৈরী হয় প্রোটিনয়েড এবং পানি পরস্পরের সংস্পর্শে আসার ফলশ্রুতিতে। এগুলো একেবারে আদি ধরণের কোষের ভুমিকা পালন করে, যাদের মধ্যে জীবনের নান্দনিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। জীবনের একক হচ্ছে কোষ, আর আদি জীবনের একক হচ্ছে আদিকোষ বা প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ার নামের প্রোটোসেলগুলো।'

জীবনের রাসায়নিক বিবর্তনের ধাপসমূহ :

মোটামুটিভাবে যে ধাপগুলো অনুসরণ করে এই পৃথিবীতে প্রাণের নান্দনিক বিকাশ ঘটেছে, তা নিয়ে এবার একটু ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা যাক। আমরা তো গত কয়েকটি পর্ব ধরে অনবরত বলেই যাচ্ছি যে, আমাদের এই মলয় শীতলা নান্দনিক পৃথিবীটা একটা সময় এত উত্তপ্ত ছিল যে, সেই আবহাওয়াতে হাইড্রোজেন, মিথেন, এমোনিয়া, কার্বন মনোক্সাইড, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি ছাড়া অন্য কোন জৈব পদার্থ ছিল না। ছিল না সেখানে মুক্ত অক্সিজেন। কাজেই সেই বিজারকীয় পরিবেশে প্রাপ্ত অজৈব পদার্থগুলো থেকে জৈব পদার্থের উৎপত্তিই হচ্ছে

জীবনের প্রাথমিক ধাপ। ধাপগুলোকে ধারাবাহিকভাবে লিখলে দাড়াবে অনেকটা এরকম :

ধাপ-১: **জৈব যৌগের উৎপত্তি :**

- হাইড্রোকার্বন উৎপাদন (মুক্ত পরমাণুগুচ্ছ CH এবং CH_2 এর বিক্রিয়া, বাষ্পের সাথে মেটালিক কার্বাইডের বিক্রিয়া)
- হাইড্রোকার্বনের অক্সি ও হাইড্রক্সি-উপজাতের উৎপাদন (বাষ্প ও হাইড্রোকার্বনের বিক্রিয়ায় এলডিহাইড, কিটোন উৎপাদন)
- কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন (গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ আর ঘনীভবনের ফলে চিনি, স্টার্চ, গ্লাইকোজেন)
- ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলের উৎপত্তি (ফ্যাট বা চর্বির ঘনীভবন)
- অ্যামাইনো এসিড গঠন (হাইড্রোকার্বন, অ্যামোনিয়া আর পানির বিক্রিয়া)

ধাপ-২: **জটিল জৈব অণুর উৎপত্তি** (পলিমার গঠন)

- প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ার
- কো-এসারভেট

ধাপ-৩: **পলিনিউক্লিয়োটাইড বা নিউক্লিক এসিড গঠন**

ধাপ-৪: **নিউক্লিয়োপ্রোটিন গঠন**

ধাপ-৫: **আদি কোষ বা ইউবায়োন্ট গঠন** (কো-এসারভেটের ভিতরে নিউক্লিয়োপ্রোটিন আর অন্যান্য অণু একত্রিত হয়ে লিপোপ্রোটিন ঝিল্লি দিয়ে আবদ্ধ প্রথম কোষ; প্রথম জীবন)

ধাপ-৬: **শক্তির উৎস ও সরবরাহ** (শক্তির সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেওয়ায়, প্রকৃতিতে টিকে রইল তারাই যারা প্রোটিনকে এনজাইমে রূপান্তরিত করে সরল উপাদান থেকে জটিল বস্তু তৈরী করতে পারত, আর সেসব দ্রব্য থেকে শক্তি নির্গত করতে পারত)

ধাপ-৭: **অক্সিজেন বিপ্লব** (অক্সিজেনহীন বিজারকীয় আবহাওয়া অক্সিজেনময় জারকীয় আবহাওয়ায় রূপান্তরিত হল - আজ থেকে দু'শ কোটি বছর আগে)

ধাপ-৮: **প্রকৃত কোষী জীবের উৎপত্তি** (প্রোক্যারিওট থেকে ইউক্যারিওট)

ধাপ-৯: **জৈব-বিবর্তন বা Biogeny** (জীব থেকে জীবে বিবর্তন)

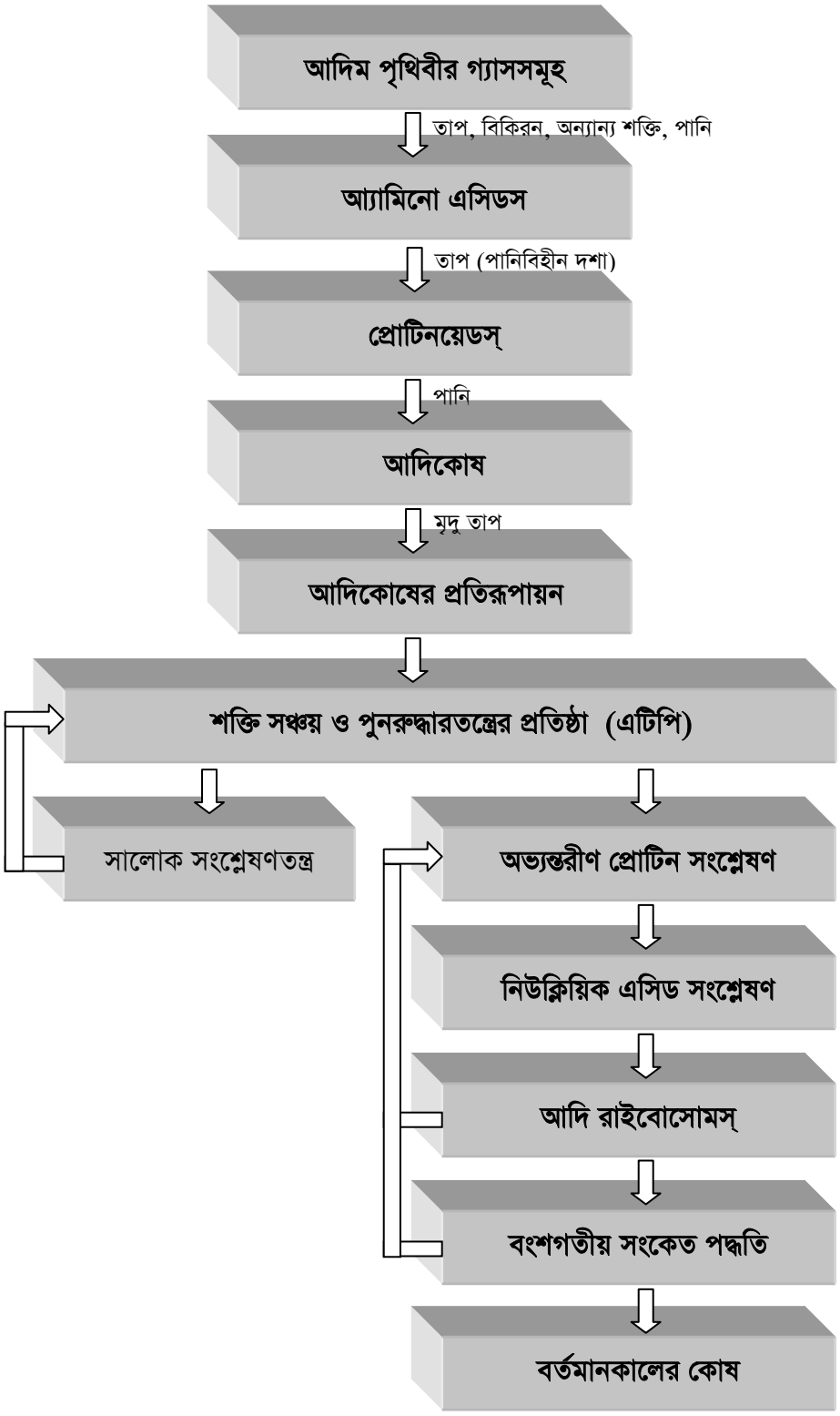

চিত্র ৫.২ : আদিম পরিবেশ থেকে জৈববস্তুর উৎপত্তি ও তাদের আন্তঃসম্পর্ক ও বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীবনের উৎপত্তির রূপরেখা (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮)

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, উপরে উল্লিখিত রাসায়নিক পরিবর্তনের এই ধাপগুলো কিন্তু একদিনে সম্পন্ন হয়নি। প্রোটিন এবং নিউক্লিক এসিড স্বতঃস্ফুর্তভাবে নানা ধরনের ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশে সংগবদ্ধ হয়েছে লক্ষ কোটি বছর ধরে। প্রকৃতি নিজেই নিজের উপর আকস্মিকতার পরীক্ষা (chance experiment of nature) করেছে বিস্তর। ফলে অজৈব পদার্থ থেকে একসময় উদ্ভুত আদি কোষগুলো নিউক্লিয়িক এসিডের সমন্বয়ে অনুলিপির ক্ষমতা অর্জন করেছে, আর সময়ের সাথে সাথে বিবর্ধিত করেছে। আসলে সহজ কথায় সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে জটিলতা। এই জটিলতা বৃদ্ধিই জীবন বিকাশের এক অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। জটিলতার অর্থ সংবাদ বা তথ্যের বৃদ্ধি। যে অণু যত সরল ও ছোট, তার ভিতরকার সংবাদ ও তথ্য তত কম। অণু যত দিনে দিনে বৃহৎ আকার অর্জন করেছে, এক থেকে বহুত্ব অর্জন করেছে, ছোট কণা থেকে বড় কণায় রূপান্তরিত হয়েছে- বৃদ্ধি করেছে জটিলতার। তাই সংক্ষেপে বলা যায়, জীবন বিকাশের আগে দরকার ছিল জটিলতা বৃদ্ধির। জটিলতা বাড়তে বাড়তে যখন জীবনোপযোগী পরিবেশ তৈরী হল, অর্থাৎ তথ্যের পাহাড় জমল, তখনই শুরু হল প্রকৃত জীবন। প্রকৃত জীবন পারল স্বপুনরাবৃত্তির ক্ষমতা অর্জন করতে; শিখল বহিঃস্থ তথ্যকে ব্যবহার করতে। কাজেই বলা যায়, জটিলতাই হচ্ছে জীবনের ভিত্তি। উপরে একটি প্রবাহচিত্রের সাহায্যে আরেকটু সহজভাবে জীবনের উৎপত্তির প্রক্রিয়াটিকে তুলে ধরা হয়েছে (চিত্র ৫.২)।

জটিলতা বৃদ্ধির ব্যাপারটি আরো পরিস্কার হবে আজকের দিনের কোষগুলোর সাথে আদি কোষ বা ‘প্রটোসেল’-এর তুলনা করলে। আদি কোষগুলোতে কোন জেনেটিক তথ্য ছিল না; অর্থাৎ ছিল না কোন ডিএনএ এবং আরএনএ, যা আজকের দিনের কোষগুলোর একটি অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য। কিভাবে তাহলে একসময় উৎপন্ন হল এই ডিএনএ এবং আরএনএ-এর?

এ প্রসঙ্গে দু’চার কথা বলা যাক। আমরা আজ জানি যে, সমস্ত জীবিত বস্তু, সে উদ্ভিদই হোক আর প্রাণিই হোক, তার প্রকৃতি নির্দেশিত হয় বংশগতির বাহক - ‘জীনের’ কতকগুলো জটিল রাসায়নিক অণুর অঙ্গুলি হেলনে। জীনের এই রাসায়নিক অণুগুলো হল ডিএনএ এবং আরএনএ; এই দুই হারমোনিয়াম আর সেতারের সমন্বিত সংযোগেই রচিত হয়েছে আমাদের জীবন-সঙ্গীতের সুর। ডিএনএ হচ্ছে *ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়িক এসিড* এবং আরএনএ হল *রাইবোনিউক্লিয়িক এসিডের* সংক্ষিপ্ত রূপ। প্রতিটি ডিএনএ-তে থাকে চার রকমের নাইট্রোজেনাস বেসের সরল অণু - A, G, C, T। আবার প্রত্যেক আরএনএ অণুতেও থাকে চার রকমের বেস- A, G, C, U। T এবং U এর মধ্যে সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু বৈসাদৃশ্যও কম নয়। আর জীবনের রসায়নে সামান্য তফাতের পরিনামও কিন্তু হতে পারে বিশাল। এই ডিএনএ এবং আরএনএ যেমন নির্ধারণ করছে আমার মাথায় কোকরানো চুল কেন, আর ফুটবলার জিদানের মাথায় টাক কেন, তেমনিভাবে বলে দিচ্ছে চিতাবাঘের গায়ে কালো ফুটকি কেন, আর কেনই বা তাল গাছ এত লম্বা! হাজার হাজার কোষ দিয়ে তৈরি হয়েছে আমাদের দেহ। জটিলতার পথ

বেয়ে এমনভাবে কোষগুলো বিবর্তিত হয়েছে যে সামান্য অতিক্ষুদ্র একটা কোষে জীবনের সমস্ত জটিল তথ্যগুলো সন্নিবেশিত থাকে। এই জটিল তথ্যগুলোকেই বিজ্ঞানীরা বলছেন - *ব্লু প্রিন্ট অব লাইফ*।

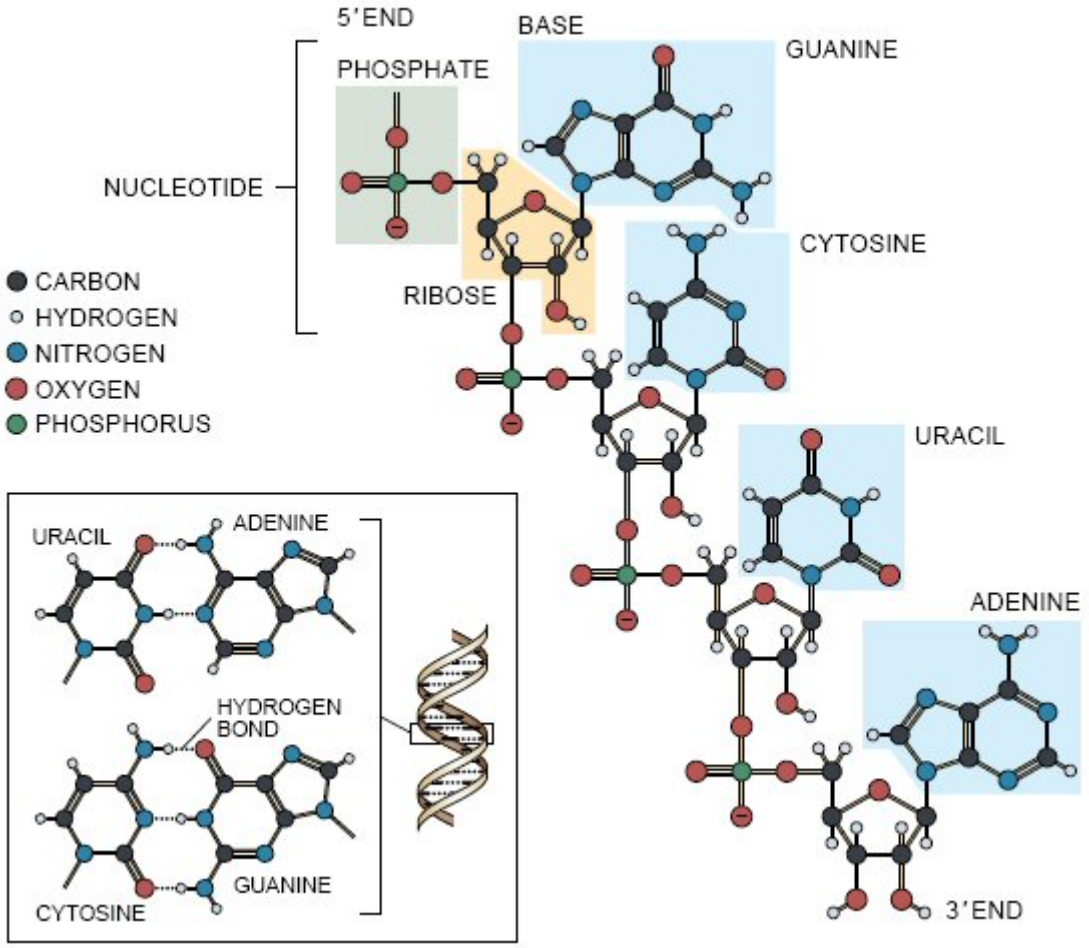

চিত্র ৫.৩ : নিউক্লিওটাইড দিয়ে তৈরী আরএনএ

যদিও এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই ব্লু প্রিন্টের রহস্য বিজ্ঞানীরা অনেকটাই সমাধান করে ফেলেছেন, তারপরও একটি সমস্যা নিয়ে তারা বরাবরই হিমশিম খেয়েছেন। কিভাবে আদি কোষে আরএনএ এবং ডিএনএ-এর মত বংশাণুসৃত দ্রব্যের অভ্যুদয় ঘটলো? প্রোটিন অণুগুলোর অভ্যুদয় আগে ঘটেছিলো, নাকি নিউক্লিয়িক এসিডের (আরএনএ / ডিএনএ)? এ অনেকটা যেন 'ডিম আগে নাকি মুরগী আগে' ধরণের সমস্যা। কারণ, বিজ্ঞানীরা দেখেছেন আজকের প্রোটিন অণু তৈরী করতে নিউক্লিয়িক এসিডের প্রয়োজন। আবার নিউক্লিয়িক এসিড তৈরী করতে দরকার এনজাইম - যেগুলো মূলতঃ প্রোটিন ছাড়া আর কিছু নয়। তাহলে কোন্‌টির

অভ্যুদয় আগে ঘটেছিল - প্রোটিন নাকি নিউক্লিয়িক এসিডের? এর দুটি সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে। আদিমকালে প্রোটিন তৈরী হয়েছিল আগে, তারপর সরলতর প্রোটিন থেকে যখন আরএনএ/ডিএনএ'র উদ্ভব হয়েছিল, তখন হয়ত কোন এনজাইমের সাহায্যের প্রয়োজন হয়নি। প্রিন্সটন ইন্সটিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি'র অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ফ্রিম্যান ডাইসন এই 'প্রোটিন আগে' (protein-first) তত্ত্বের একজন জোরালো প্রবক্তা। তত্ত্ব দিলে কি হবে, এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা বের করতে পারেননি যে কিভাবে ওই আদি প্রোটিনগুলো প্রতিরূপায়নের (replication) ক্ষমতা অর্জন করেছিল। কিন্তু সম্প্রতি স্যান ডিয়াগোর স্ক্রিপস ইন্সটিটিউটের রেজা ঘাদিরি তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে কিছু পেপটাইডের শিকল সত্যি সত্যি প্রতিরূপায়ন ঘটাতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রতিরূপায়ন ঘটাতে গিয়ে ঘটা ভুলের সংশোধনও করতে চেষ্টা করে; দেখে মনে হয় সত্যই এগুলোর ভিতর 'মন বলে কোন কিছু আছে' (Cohen, 1996)! এ ছাড়া 'ম্যাড কাউ' রোগের উৎস হিসেবে যে প্রিয়নের কথা আমরা একটু আগে জেনেছি তারাও তো স্রেফ প্রোটিন দিয়ে তৈরী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের প্রতিলিপি তৈরী করে রোগ ছড়াতে পারছে। আরেকটি সম্ভাব্য সমাধান হচ্ছে সেই যে তথাকথিত 'আরএনএ পৃথিবীর' ধারণা, যেটি ইদানিং বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ছে। ষাটের দশকে কার্ল উস, ফ্রান্সিস ক্রিক এবং লেসলি অর্গেল পৃথকভাবে প্রস্তাব করেন যে, প্রোটিন এবং ডিএনএ তৈরীর আগে আরএনএ-ই প্রথম তৈরি হয়েছিল এবং গঠন করছিল সেই আরএনএ পৃথিবী (RNA world)। এ শুধু কল্পনা নয়। আজকের পৃথিবীতেও অনেক তামাকের মোজাইক এবং সরল ভাইরাস পাওয়া যায়, যাতে ডিএনএ-এর ছিটেফোঁটাও নেই, পুরোটাই আরএনএ। আদিম পৃথিবীতে এই আরএনএ-গুলো জীবন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে কাজ করত এবং নিজেদের প্রতিরূপায়ন (replication) ঘটাতে পারত। শুধু তাই নয়, ধারণা করা হয় যে, সে সময় আরএনএ অ্যামাইনো এসিডের সাথে সংযুক্ত হয়ে প্রোটিনের অণুও গঠন করতে পারত। এ হতেই পারে, কারণ ধারণা করা হয় যে আদিম পৃথিবীর আরএনএ-এর দুটো বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যা আজকের পৃথিবীতে নেই : এক - প্রোটিনের সাহায্য ছাড়াই প্রতিরূপায়ন করার ক্ষমতা, এবং দুই - প্রোটিন সংশ্লেষনের প্রতিটি ধাপকে অনুঘটিত (catalyze) করার ক্ষমতা। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন ডিএনএ অণু তৈরী হয়েছে পরে।

প্রোক্যারিওট বা আদিকোষের যখন উদ্ভব ঘটেছিল তখন তাদের বিবর্তন হচ্ছিল বিভিন্ন রূপে। কোনটার হয়তো চলফেরা করার জন্য সুগঠিত ফ্লাজেলা ছিল, কোনটা হয়ত ছিল বাতাস থেকে অক্সিজেন নেওয়ার ব্যাপারে পারদর্শী, আবার কোনটার শরীরে হয়ত ছিল ক্লোরফিল। কোন এক সময়ে চলমান একটা প্রোক্যারিওট হয়তো কোন একভাবে এসে মিশেছিল অক্সিজেনবাহী প্রোক্যারিওটের সাথে অথবা ক্লোরফিলবাহী একটা প্রোক্যারিওটের সাথে, কিংবা হয়ত একসঙ্গে

দুটোর সাথেই। এই রকম মেশামেশির ফলে যে জিনিসটা তৈরী হল তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মোকাবেলায় একক প্রোক্যারিওটের চেয়ে অনেক দক্ষ হবে। সংঘবদ্ধ হলে যে দক্ষতা বাড়ে তা তো শুধু জৈব জগতে নয়, সামাজিক জীবনেও প্রমাণিত। পিঁপড়ের ঢেলা, উইয়ের বাসা কিংবা মৌমাছির চাকগুলোর দিকে তাকান। সংঘবদ্ধতার উৎকর্ষতা হাতে নাতে পেয়ে যাবেন। গরিলা কিংবা হাতীর মত স্তন্যপায়ী জীবেরা যে দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করে দক্ষতা বাড়িয়ে তোলে তা বলাই বাহুল্য। আর সংঘবদ্ধতার শ্রেষ্ঠতম নমুনা তো আমাদের মানব সমাজ। কাজেই সংঘবদ্ধতার কারণেই প্রোক্যারিওটদের উপনিবেশগুলোই টিকে থাকলো আর বাড়বাড়ন্ত হলো এদের।

এ ধরনের মেশামিশি করতে গিয়েই আজ থেকে ১৪০ কোটি বছর আগে বিভিন্ন রকমের প্রোক্যারিওটের সংমিশ্রনে ইউক্যারিওট বা প্রকৃতকোষী জীবের উদ্ভব ঘটে। ইউক্যারিওটীয় কোষগুলো যে বহু প্রোক্যারিওটীয় কোষের সমষ্টি তা লিন্ মাগোর্লিস (১৯৩৮-) খুব জোরের সাথে সমর্থন করেন। ধারণা করা হয় প্রোক্যারিওটরা একে অপরের সাথে জুড়ে জুড়ে যখন ক্রমশ বড় থেকে আরো বড় কোষ তৈরী করেছিল, তখন তাদের আয়তন ও জেনেটিক পদার্থের পরিমানও গেল বেড়ে। দেখা গেল ক্রোমোজোমগুলো গোটা কোষের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে কোষ বিভাজন ঘটা মুশকিল। তাই যে সব মিশ্রিত-প্রোক্যারিওটগুলোর ক্রোমাটিন ছোট নিউক্লিয়াসে কেন্দ্রীভূত ছিল প্রকৃতি তাদের বাড়তি সুবিধা দিল-ফলে তারাই সে সময় ভালভাবে টিকেছে এবং কালের ধারাবাহিকতায় একসময় মিশ্রিত-প্রোক্যারিওটগুলো পরিণত হয়েছে ইউক্যারিওটে। ১৯৫৪ সালে মার্কিন জীবাশ্মবিদ এলসো স্টেরেনবার্গ বার্গ্হন্ উত্তর আমেরিকার অন্টারিও প্রদেশের দক্ষিণ দিকে প্রাচীন পাথরের বুকে সর্বপ্রথম এই ধরণের আদি ইউক্যারিওটের খোঁজ পান। তারপর থেকে এধরণের বস্তু এত দেখা গেছে যে এগুলো অতি আদিম ইউক্যারিওট তা নিয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন যে ইউক্যারিওট- তা এক ধরনের শৈবাল; এদের নাম দেওয়া হয়েছে *আক্রিটার্ক্*। এদের বয়স প্রায় ১৪০ কোটি বছর।

সবচেয়ে প্রাচীন যে প্রোক্যারিওটের সন্ধান এ পৃথিবীতে পাওয়া গেছে তা সম্ভবতঃ ৩৬০ কোটি বছরের পুরোন। তার মানে পৃথিবীর বয়স যখন মোটামুটি ১০০ কোটি বছর পেরিয়েছে তখন থেকেই প্রাণের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতে ছিল, অন্ততঃ প্রোক্যারিওট-রূপে। ২০০ কোটি বছরেরও বেশী সময় ধরে পৃথিবীতে জীব বলতে ছিল শুধু তারাই। কোষ-ওয়ালা যাবতীয় জীবের অস্তিত্ব যতদিন, এই সময়টা তার অর্ধেকেরও বেশী। ৩৬০ কোটি বছরের পুরোন প্রোক্যারিওটের সন্ধান বিজ্ঞানীরা যেখানে পেয়েছেন সেখানে তারা চ্যাপটা জটবাধা আর ভিতরে পলিপড়া নানান জৈব স্তরের সৃষ্টি করেছে। এগুলোর নাম হল *স্ট্রোমাটোলাইট* (গ্রীক ভাষায় এর অর্থ হল

'বিছানার চাদর')। নীচে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া স্ট্রোমাটোলাইটের ছবি দেখানো হয়েছে (চিত্র ৫.৪) ।

চিত্র ৫.৪ : অস্ট্রেলিয়ার শার্ক অববাহিকায় গড়ে ওঠা স্ট্রোমাটোলাইটের ছবি। লস এঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জে উইলিয়াম স্কোফ ৩৬০ কোটি বছরের পুরোন স্ট্রোমাটোলাইটের ধবংসাবশেষের সন্ধান পেয়েছেন । ৩৫০ কোটি বছরের পুরোন জীবাশ্মের সাথে আধুনিক সায়নোব্যাকটেরিয়ার মিল পাওয়া যায়।

জীবনের সূচনার ধাপগুলোর দিকে আরেকটিবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক :

১) প্রথমে তৈরী হল ছোট্ট একটা একতন্ত্রী আরএনএ অণু - এনজাইমের সাহায্য ছাড়া প্রতিরূপায়ণে এবং সরল প্রোটিন অণু তৈরীর ক্রিয়ায় অণুঘটক হিসেবে সেটি কাজ করতে সক্ষম।

২) যে সব প্রোটিন অণু এই আরএনএ-এর ঘটকালিতে তৈরী হল, তাদের সংস্পর্শে এল এই আরএনএ, তাতে আরএনএ অণুর স্থায়িত্ব বেড়ে গেল। এই অণু তখন আরো লম্বা হতে পারলো, প্রতিরূপায়নেও আরো দক্ষ হল।

৩) আরএনএ থেকে ডিএনএ অণু তৈরী হল, হয়ত আরএনএ-এর প্রতিরূপায়নে কিছু ভুলের কারণে। কিন্তু দেখা গেল এই অণু আরএনএ-এর চেয়ে অনেক বেশী স্থায়ী, এর বেনী অনেক লম্বা, তথ্য এতে অনেক নিরাপদে সঞ্চিত থাকে; প্রতিরূপায়নে ঝামেলা এবং ভুল দুই-ই কম হয়। প্রোটিনের সাথে সহাবস্থানের কারণে ক্রমশঃ এর আকার জটিলতর হল, এবং এদের কার্যকারিতাও বাড়তে থাকল।

৪) ভাইরাসের মত সরল কোষী জীবের অভ্যুদয় ঘটল, তারপর তাদের ক্রমবিকাশের ফলে তৈরি হল প্রোক্যারিয়োট বা আদিকোষের, তা থেকে একসময় জন্ম নিল ইউক্যারিওট বা প্রকৃতকোষী জীবের। তা থেকে অন্য সমস্ত জীব।

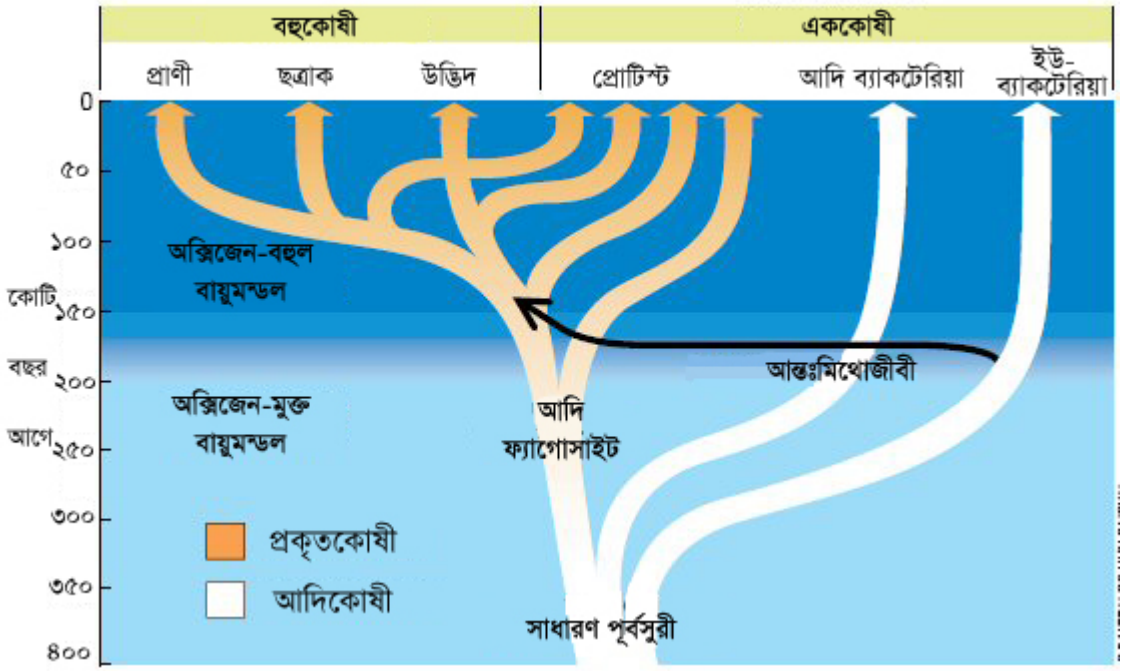

চিত্র ৫.৫ : জীবনের পল্লবিত বৃক্ষ : প্রাণের বিকাশ ও বিবর্তনের রেখচিত্র

সম্ভাবনার জগৎ ও প্রাকৃতিক নির্বাচন:

অনেকেই মনে করেন, আমাদের এই পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি স্রেফ একটা দুর্ঘটনা বা চান্স। ঘটনাচক্রে দৈবাৎ (by chance) প্রাণের উল্লম্ফন ঘটেছে । এ যেন অনেকটা হঠাৎ লটারী জিতে কোটিপতি হওয়ার মতই একটা ব্যাপার। বিজ্ঞানী মুলার এ ধরনের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করতেন। কম সম্ভাবনার ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। অহরহই তো ঘটছে। ভূমিকম্পে বাড়ী-ঘর ধবসে পড়ার পরও অনেক সময়ই দেখা গেছে প্রায় 'অলৌকিক'ভাবেই ভগ্নস্তুপের নীচে কেউ বেঁচে আছেন। নিউইয়র্ক টাইমস-এ একবার এক মহিলাকে নিয়ে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল যিনি দু দুবার নিউজার্সি লটারির টিকেট জিতেছিলেন। তারা সম্ভাবনা হিসেব করে দেখেছিলেন ১৭ ট্রিলিয়নে ১। এত কম সম্ভাবনার ব্যাপারও ঘটছে। কাজেই প্রাণের আবির্ভাব যত কম সম্ভাবনার ঘটনাই হোক না কেন, ঘটতে পারেই।

কিন্তু জীববিজ্ঞানীদের কাছে স্রেফ সম্ভাবনার মার-প্যাঁচ থেকেও ভাল উত্তর আছে, প্রাণের আবির্ভাবের পেছনে। সেটি কী, তা বলবার আগে আমাদের প্রাণের উন্মেষের সম্ভাবনাটি হিসেব করা যাক। ধরা যাক, আমাদের গ্যালাক্সিতে $১০^{১১}$ টি তারা আর $১০^{৬০}$ টি ইলেকট্রন আছে। দৈবাৎ এ ইলেকট্রনগুলো একত্রিত হয়ে আমাদের গ্যালাক্সি, কোটি কোটি তারা, আমাদের পৃথিবী এবং শেষ পর্যন্ত এই একটি মাত্র গ্রহে উপযুক্ত পরিবেশে প্রথম কোষটি গঠনের সম্ভাবনা কত? আমাদের গ্যালাক্সি এবং পৃথিবীর যে বয়স, তা কি ওই সম্ভাবনা সফল করার জন্য যথেষ্ট? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। কারণ এই সম্ভাবনা মাপতে গেলে যে হাজারটা চলক নিয়ে কাজ করতে হয়, তার অনেকগুলো সম্বন্ধে আমরা এখনও অনেক কিছু ঠিকমত জানি না। তবে কৃত্রিম একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটিকে সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। কেয়রেন্স-স্মিথ (Cairns-Smith, 1970) এমনি একটি কৃত্রিম উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ধরা যাক একটা বানরকে জঙ্গল থেকে ধরে নিয়ে এসে টাইপরাইটারের সামনে বসিয়ে দেয়া হল। তারপর তার সামনে ডারউইনের 'প্রজাতির উৎপত্তি' নামক বইটি খুলে এর প্রথম বাক্যটি টাইপ করতে দেয়া হল। বাক্যটি এরকম :

> When on board HMS Beagle, as a naturalist, I was much struck with certain facts in the distribution of the inhabitants of South America, and in the geological relations of the present to the past inhabitants of that continent.

এই লাইনটিতে ১৮২ টি অক্ষর আছে। বানরটিকে বলা হল এই লাইনটিকে সঠিকভাবে কাগজে ফুটিয়ে তুলতে। এখন বানর যেহেতু অক্ষর চিনে না, সেহেতু সে টাইপ্রাইটারের চাবি অন্ধভাবে টিপে যাবে। টিপতে টিপতে দৈবাৎ একটি শব্দ সঠিক ভাবে টাইপ হতেও পারে। কিন্তু একটা শব্দ টাইপ হলে চলবে না, পুরো বাক্যটি সঠিকভাবে যেমনিভাবে লেখা আছে - ঠিক তেমনিভাবে- টাইপ হতে হবে। মানে শুধু সবগুলো শব্দ সঠিক ভাবে টাইপ নয়, এর ধারাবাহিকতাও রাখতে হবে। এখন এই বানরটির এই বাক্যটি সঠিকভাবে টাইপ করার সম্ভাবনা কত? কত বছরের মধ্যে অন্ততঃ একবার হলেও বানরটি সঠিকভাবে বাক্যটি টাইপ করতে পারবে? সম্ভাবনার নিরিখে একটু বিচার-বিশ্লেষণ করা যাক।

মনে করা যাক যে, টাইপরাইটারটিতে ৩০ টি অক্ষর আছে এবং বানরটি প্রতি মিনিটে ৬০ টি অক্ষর টাইপ করতে পারে। শব্দের মধ্যে ফাঁক-ফোকর গুলো আর বড় হাত-ছোট হাতের অক্ষরের পার্থক্য এই গণনায় না আনলেও, দেখা গেছে পুরো বাক্যটি সঠিকভাবে টাইপ করতে সময় লাগবে $১০^{৮০}$ বছর, মানে প্রায় অনন্তকাল! কিন্তু যদি এমন হয় যে, একটি সঠিক শব্দ লেখা হবার সাথে সাথে সেটিকে আলাদা করে রাখা হয়, আর বাকী অক্ষরগুলো থেকে আবার

নির্বাচন করা হয় বানরের সেই অন্ধ টাইপিং এর মাধ্যমে, তবে কিন্তু সময় অনেক কম লাকবে, তারপর ১৭০ বছরের কম নয়। কিন্তু যদি এই নির্বাচন শব্দের উপর না হয়ে অক্ষরের উপর হয়ে থাকে (অর্থাৎ, সঠিক অক্ষরটি টাইপ হওয়ার সাথে সাথে এটিকে আলাদা করে রেখে দেয়া হয়); তবে কিন্তু সময় লাগবে মাত্র ১ ঘন্টা, ৩৩ মিনিট, ৩০ সেকেন্ড। ১৯৮০র দিকে গ্লেনডেল কলেজের রিচার্ড হার্ডিসন একই ধরনের একটি কৃত্রিম বাক্যাংশ নির্বাচনের কম্পিউটর প্রোগ্রাম তৈরী করে তাতে দেখান যে র‍্যান্ডমলি বাক্যাংশ নির্বাচন করে শেক্সপিয়রের গোটা হ্যামলেট নাটিকাটি সারে চার দিনে একেবারে অগোছালো অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ সঠিক ভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা সম্ভব।

অনেকেরই হয়ত জানা নেই জীবজগতেও এই অক্ষর নির্বাচনের মতই একধরনের নির্বাচন সৃষ্টির শুরু থেকেই চলে আসছে, এটাকে বলে ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’। প্রাকৃতিক নির্বাচনের ব্যাপারটা কিন্তু ভারী মজার। রোমান্টিক ব্যক্তিরা হয়ত এর মধ্যে রোমান্সের গন্ধ পাবেন। জীব জগতে স্ত্রীই হোক আর পুরুষই হোক কেউ হেলা ফেলা করে মেশে না। মন-মানসিকতায় না বনলে, প্রকৃতি পাত্তা দেবে মোটেই। প্রকৃতির চোখে আসলে লড়াকু স্ত্রী-পুরুষের কদর বেশী। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃতি যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে বেছে নেয় আর অযোগ্য প্রতিদ্বন্দীকে বাতিল করে দেয়, ফলে একটি বিশেষ পথে ধীর গতিতে জীবজন্তুর পরিবর্তন ঘটতে থাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স, এই ‘ন্যাচারাল সিলেকশন’ বা প্রাকৃতিক নির্বাচনকে ‘ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি তার ‘ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার’ বইয়ে বলেন (Dawkins, 1996) :

> “Natural selection, the unconscious, automatic, blind yet essentially non-random process that Darwin discovered, has no purpose in mind. If it can be said to play the role of watchmaker in nature, it is the blind watchmaker.”

অধ্যাপক ডকিন্সসহ অনেক জীববিজ্ঞানীই মনে করেন, স্রেফ ‘চান্স’ নয়, পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব আর বিকাশ ঘটেছে আসলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবে। তাই সময় লেগেছে অনেক কম। প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাড়া বিবর্তন হলে জীবজগৎ এত কম সময়ে এভাবে বিবর্তিত হত না।

স্বতঃজননবাদ বনাম জৈব রাসায়নিক তত্ত্ব

জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্বকে কিন্তু লুই পাস্তুর কর্তৃক পরিত্যক্ত স্বতঃজনন তত্ত্বের সাথে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্বটি কাজ করে ধাপে ধাপে রাসায়নিক পরিবর্তন এবং জটিলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে। প্রাক-জীবনপূর্ব সময়ে আনবিক স্তরেও হয়ত চলেছিল

'প্রাকৃতিক নির্বাচনের খেলা' যাকে এখন 'আণবিক নির্বাচন' (molecular selection) নামে অভিহিত করা হয় (Fox, 1998)। বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে বহু 'সিমুলেশন পরীক্ষা' করেছেন, যার মাধ্যমে এ তত্ত্বের বাস্তবতা ইতোমধ্যেই নানা ভাবে প্রমাণিত হয়েছে (Spiegelman, 1967; Eigen and Schuster, 1979; Julius Rebek, 1994, Cohen, 1996)। অথচ সৃষ্টিবাদীরা (Creationists) এ বিষয়টিকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন এবং সোজা সাপটা বলতে চান যে রাসায়নিক বিবর্তন তত্ত্ব সরাসরি ওই ঘরের কোনায় ফেলে রাখা ঘর্মাক্ত কাপড় চোপর থেকে ইঁদুর কিংবা লবনাক্ত পানিতে ফেলে রাখা ফার থেকে রাজহাঁস উৎপন্ন হবার কথা বলছে, যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে লুই পাস্তুর ভুল প্রমাণ করেছেন (তৃতীয় অধ্যায় দ্রঃ)।

প্রশ্ন উঠতেই পারে আদি পৃথিবীতে যদি জড় থেকে জীবের উদ্ভব ঘটে থাকে, তাহলে এ ধরণের ঘটনা আজ ঘটছে না কেন? এর উত্তর হচ্ছে আদিমকালে পৃথিবীর অবহমন্ডলের অবস্থা আজকের পৃথিবীর মত ছিল না। তাই এখন যে বাধা অনতিক্রম্য বলে মনে হয়, তখন হয়ত তা ছিল না। যেমন আজকের পৃথিবীতে রয়েছে প্রচুর অক্সিজেন, অথচ আদিম কালের পৃথিবীর আবহমন্ডলে অক্সিজেন প্রায় ছিল না বললেই চলে। শুধু একারণেই ঘটতে পারে বিশাল পার্থক্য (আসিমভ, ২০০৬)।

আর তা ছাড়া যদি ধরেও নেই এখনো রাসায়নিক বিবর্তনে জীবনের উদ্ভব ঘটছে সেগুলোকে প্রথমতঃ বিদ্যমান প্রাণ থেকে পৃথক করা কঠিনই হবে (Berra, 1990)। আর দ্বিতীয়তঃ এর ফলে প্রাক-জীবনধারী যে সমস্ত জিনিস এ পৃথিবীতে তৈরী হবে, সেগুলো অজস্র জীবের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে নিমেষের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। ফলে প্রাকৃতিক নিবার্চনে এগুলোর টিকে থাকার কথা নয়। অথচ আদিম পৃথিবীতে অন্য প্রাণী যখন ছিল না, তখন এই প্রাক জীবনধারীরা বিকশিত হতে পারতো অবাধে।

আমরা অগামী পর্বে একটা কৌতুহোদ্দীপক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। জীববিজ্ঞানের এক অদ্ভুত শাখা আছে, এর নাম 'Exobiology', যার বাংলা করলে বলতে পারি মহাকাশ জীববিদ্যা। আমাদের এ পৃথিবী ছাড়াও অন্য কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা, কিংবা এর সম্ভাব্যতা কতটুক এটি হবে আগামী অধ্যায়গুলোর আলোচ্য বিষয়।

পুনর্লিখন : অক্টোবর ২, ২০০৬

{পঞ্চম অধ্যায়, *প্রাণের উৎস সন্ধানে বিজ্ঞান (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে)* : অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ; অবসর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিতব্য}

পরবর্তী পর্ব দ্রষ্টব্য...